মিশরের স্বপ্ন, স্বপ্নের মিশর

বিপুল রঞ্জন সরকার

পুনশ্চ

সূচিপত্র

পিরামিড	০৯
সাক্কারা	২০
স্ফিংস	২৩
লাক্সর	২৮
ভ্যালি অব দ্য কিংস	৪০
এডফু	৫৪
কোমওম্বো	৫৯
আবু সিম্বেল	৬৫
ফিলে	৭০
আসোয়ান	৭৫
কায়রো	৮০
আলেকজান্দ্রিয়া	৯৬
সুয়েজ ক্যানাল	১০৮
শর্ম-এল-শেখ	১১৩
পশ্চিম মরুভূমি	১১৫
ওবিলিস্ক	১১৭
মিশরীয় শিল্পকলার বিদেশে পাচার	১২০
রবীন্দ্রনাথ ও মিশর	১২৩
আধুনিক মিশর ও ভারত	১২৫
সময় সারণি	১২৭

পিরামিড

'মানুষ ভয় পায় সময়কে, সময় ভয় পায় পিরামিডকে'-প্রাচীন মিশরের প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ। মানুষের অপর কোনো সৃষ্টি সম্পর্কে এই প্রবাদ প্রযোজ্য, এমনটি জানা নেই। পিরামিড যেভাবে কয়েক সহস্র বৎসর এক জায়গায় একইভাবে দণ্ডায়মান তাতে মনে হতেই পারে কাল তার কাছে পরাস্ত। ভবিষ্যৎ জানি না, কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে এটা সত্যি। সম্ভবত পিরামিডের দুর্বার আকর্ষণের মূলে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে এটাও একটা কারণ। বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের কাছে এ এক প্রবল বিস্ময়। প্রাচীন সভ্যতা আমাদের সবসময়ই টানে। মিশরের সভ্যতা প্রাচীনতম চারটি সভ্যতার অন্যতম। জওহরলাল নেহরুর কথায়, 'প্রাচীন তাম্রযুগের সভ্যতায় তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহেঞ্জোদরোর সমসাময়িক যুগে ভিন্নধর্মী ও পৃথক চরিত্রের চারটি সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। এগুলি মিশরীয়, মেসোপটেমিয়ান, ভারতীয় এবং চৈনিক।' তবে ভারত ও চিনের সভ্যতার ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা যেভাবে বজায় আছে অপর দুটি ক্ষেত্রে তা হয়নি। নেহরুর কথা ধার করে বলা যায়, 'হাজার বৎসর স্থায়িত্ব লাভের পর মিশরের চমৎকার প্রাচীন সভ্যতা অদৃশ্য হয়ে যায়। পিরামিড, স্ফিংস, বিশাল আকৃতি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও মমি ছাড়া আর কোনো চিহ্ন পেছনে ফেলে যায়নি। অবশ্য দেশরূপে মিশর এখনও বর্তমান, নীলনদ প্রাচীনকাল থেকে একইভাবে প্রবহমান এবং অন্যান্য দেশের মতোই এখানে মানুষ বসবাস করে। কিন্তু আধুনিক যুগের এই মানুষের সঙ্গে তাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সংযোগকারী কোন সেতু নেই।' অর্থাৎ আধুনিক ইজিপ্টের নাগরিক সমাজ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পরম্পরা বহন করে এমন দাবি করা যায় না। প্রাচীন মিশরের হাত থেকে আধুনিক ইজিপ্ট রিলে রেসের কাঠিটা তুলে নিতে ভুলে গেছে। কিন্তু সুপ্রাচীন স্থাপত্যগুলি শুধু মিশর নয় সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। তা দেখে আঁচ করা যায় দূর অতীতে মানুষ সমৃদ্ধির কোনো উচ্চতায় পৌঁছেছিল।

ভ্রমণসূচিতে মানুষের অতীতের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দর্শন অগ্রাধিকার। স্বদেশে প্রাচীন সভ্যতার স্মারকগুলির মতোই গ্রিস, রোম, মিশর, ইস্তাম্বুল, চিন সহ কোথাও যাবার সুযোগ হলে আর কিছু চাই না। যাত্রার লক্ষ তুরস্ক, বিশেষত ইস্তাম্বুল এবং মিশর। সঙ্গে গ্রিসও ছিল কারণ তুরস্কের সীমান্ত লাগোয়া গ্রিস। কিন্তু যাওয়া হয়নি, কারণ এথেন্সে জাতিগত দাঙ্গা চলছিল এবং ঘন ঘন কার্ফ্যুর কবলে পড়েছিল শহরটা। ইস্তাম্বুল-এর আকর্ষণও দুর্দমনীয় -

অসাধারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের উপকরণ থরে থরে সাজানো। উপরন্তু ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এমন চমকপ্রদ যা বিশ্বের আর কোথাও নেই। একটা শহর ছড়িয়ে আছে এশিয়া এবং ইউরোপ দুটো মহাদেশে। সেটা পৃথক প্রসঙ্গ।

রাতে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর থেকে কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা। অতি প্রত্যুষে, বরং শেষ রাত বলাই ভালো-টার্কিস এয়ারলাইন্সের বিমানটি কায়রোর মাটি স্পর্শ করে। কাস্টমস, ইমিগ্রেশন প্রভৃতি নানা হ্যাপা সামলে বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাদের স্থানীয় গাইড-কাম-ম্যানেজার ইংরেজিতে লেখা একটা প্ল্যাকার্ড মাথার ওপর যথারীতি দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে। আমরা তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাঁর চারদিকে ভিড় করি। রাতে পথঘাট খুব ঠাহর করতে পারিনি। তিনি মিনিট দশেক হাঁটিয়ে আমাদের নিয়ে যান একটা স্ট্যান্ডে যেখানে বাস প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওই জায়গাটায় আলো কম থাকায় কেমন গা ছমছম করে ওঠে। আশে পাশে দীর্ঘদেহী হাতে গোনা কয়েকজন। তবে বাসে উঠতে উঠতে দেখি আরও অনেক যাত্রী এসে স্থানীয় ট্যুর ম্যানেজারদের সঙ্গে অন্য বাসে উঠছে। মালপত্র ভলভো বাসের মস্তবড়ো পেটের খোলে জনাকয়েক কুলি টেনে তুলে দেয়। সাধারণভাবে জীর্ণ আলখাল্লা বা গালিয়াব পরা হলেও কুলিদের চেহারায় দারিদ্রের ছাপ বেশ স্পষ্ট। তারাও আমাদের দেশের কুলির মতোই শহরের উপকণ্ঠে, বস্তিতে কিংবা রেলস্টেশন বা বিমানবন্দরের আশেপাশে বাস করে কিংবা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটায়। এই একটা ব্যাপারে আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের মিল বেশ লক্ষণীয়।

তারপর আমাদের যাত্রা শুরু। বাস চলতে শুরু করলে গাইড নিজের নামগোত্র আমাদের জানান। রসিকতা করে বলেন, আহমেদ নামে ডাকলে পথে একসঙ্গে বিশ পঞ্চাশজন সাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কারণ, আকবর এবং আহমেদ এই দুটি নাম মিশরবাসীর অর্ধেক মানুষের। অত্যন্ত অমায়িক সাতাশ আঠাশ বৎসরের যুবকটি সুদর্শন, সদালাপী এবং মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরাতত্ত্ব নিয়ে বৎসরকয়েক আগে এম এসসি পাশ করেছেন। এখন গাইড। আমরা যখনই যে শহরে গেছি, সেখানেই স্থানীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ম্যানেজার বা গাইডের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আসলে আমাদের দেশের ট্যুর কোম্পানি সংশ্লিষ্ট দেশের কোনো ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। সেই কোম্পানি আবার দেশের বিভিন্ন শহরে অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো কোম্পানিগুলিকে স্থানীয় ভ্রমণ পরিচালনা আউট সোর্সিং করে। তারাই পরিবহন, হোটেল, খাওয়াদাওয়া এবং ভ্রমণসূচি চূড়ান্ত করে। আমাদের বর্তমান গাইড তেমনি কায়রো শহরে বিশিষ্ট এক পর্যটন কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। ঘোরাফেরার পুরো বন্দোবস্ত তাঁরা আগেই করে রেখেছেন। ওই রাতেই আমরা পৌঁছে যাই চল্লিশ কিলোমিটার দূরে পিরামিডের আসল শহর গিজাতে। তখনও সূর্য ওঠেনি। আহমেদের তৎপরতায় আমাদের বিখ্যাত 'পিরামিড' হোটেলে ঠাঁই হয়। পাশাপাশি, সামনাসামনি, বহু তিন থেকে পাঁচ তারা হোটেল।

প্রতিটির স্থাপত্য নজর কেড়ে নেওয়ার মতো। আমাদের হোটেলের ভেতরের পরিবেশ খুবই চমৎকার-নানা ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় শোভিত লবিতে বেশ বড়ো একটি প্রস্রবণ। ঘরগুলিও সুসজ্জিত।

ছাত্র জীবনে সমুদ্র দেখার তীব্র আকর্ষণের কথা মনে পড়ে। অধীর হয়েছিলাম। যখন পুরী স্টেশনে নামি, তখন ধৈর্য যেন আর বাঁধ মানে না। রিকশোয় বাইরে বেরুনোর পর চালক বলে, সমুদ্রের ধার দিয়ে যাবে। আর সমুদ্র নাকি একটু এগোলে সামনে পড়বে। বার্ধক্যে পিরামিড দর্শনের আকর্ষণ অবিকল সেই রকমের। হোটেলে গিয়ে ঘরে হাত মুখ ধুয়ে প্রায় জেগেই বসে থাকি। কখন সকাল হবে-দিনের আলোয় হোটেলের আট তলা থেকে পিরামিডের চূড়া দেখতে পাব। অবশেষে কাকভোরে স্বপ্ন সফল হয়। দূরের কুয়াশায় আবছা তিনটে পিরামিডের চূড়া দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে। প্রাণভরে একবার দেখে শুতে যাই।

খানিকটা বেলা হলে উঠে প্রাতঃরাশ করে তৈরি হতে হয়। সাড়ে নটা নাগাদ বাস ছাড়ে। পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে একেবারে বালুকাময় প্রান্তরে পিরামিডের সামনে। ঝলমলে রোদ্দুরে অত্যুজ্জ্বল চূড়াগুলির সামনে যেটা পড়ে সেটা সবচেয়ে বড়ো এবং উঁচু। সার সার পর্যটকদের বাসগুলো দাঁড়িয়ে। নানা দেশ থেকে সমাগত পর্যটকদের বৈচিত্র্যও দর্শনীয়। পাশাপাশি সর্বাঙ্গে দারিদ্রের ছাপ নিয়ে হাজির বেশ কয়েকজন ভিখারি। ছোটোখাটো ফেরিওয়ালা অল্পদামি স্মারক বিক্রির জন্য পর্যটকদের পীড়াপীড়ি করছে। পর্যটকদের মধ্যে মনে হল জাপানিদের সংখ্যা বেশি। হয়তো ওই একটি বিশেষ দিনে তাদের সমাগম ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, অন্যান্য দেশেও প্রায় সর্বত্র তাদের দেখে বোঝা যায়, ওরা পর্যটনপ্রিয়।

এবার মূল পিরামিড প্রসঙ্গ। সর্ববৃহৎ এই পিরামিড খুফুর। এটি চিয়োপ্‌স-এর পিরামিড বলেও পরিচিত। গিজাতে এটি প্রাচীনতম, যদিও সারা মিশরে নয়। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম সপ্তাশ্চর্যের একটি। পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে হেরোডোটাস বিশ্বের সাতটি অত্যাশ্চর্য জিনিসের তালিকা তৈরি করেন। শীর্ষে ছিল গিজার পিরামিড। কালের প্রবাহে অবশিষ্ট ছটি বর্তমানে অস্তিত্বশূন্য, শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গিজার পিরামিড। তারপর মধ্য ও আধুনিক যুগে অত্যাশ্চর্য জিনিসের একাধিক তালিকা প্রণীত হয়েছে। তাতে অনেক পার্থক্য থাকলেও পিরামিডকে কেউ তালিকার বাইরে রাখতে পারেননি। 'তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে অপরাপর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলির বিকাশের শেষ পর্বে নির্মিত হয় মিশরের বিশাল পিরামিড ও গিজায় স্ফিংস্।' (জওহরলাল নেহরু)

বাস থেকে নেমে সামনে দাঁড়াই। দেখি সুউচ্চ পর্বতসদৃশ চতুষ্কোণ বিশালাকার এক মহান কীর্তি। হতবাক। পাহাড়-পর্বত সমুদ্র-মরু প্রভৃতি সবই বিস্ময়কর। কিন্তু তার স্রষ্টা প্রকৃতি। কিন্তু এ তো মনুষ্যসৃষ্টি। কীভাবে সম্ভব! ছশো পঁচিশ মাইল দূরবর্তী পাহাড় কেটে এত বড়ো সব পাথরের চাঁই কীভাবে কোন্ যানে কে আনল, কারা আনল! কোনো কোনো প্রস্তর খণ্ডের ওজন তো প্রায় আশি টন। অথচ মানুষই করেছে এবং করেছে প্রায় পাঁচ

হাজার বৎসর আগে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি তেমনভাবে ঘটেনি। গোড়াতে এর উচ্চতা ছিল চারশো অষ্টাশি ফুট। চার হাজার তিনশো বৎসর ধরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থাপত্য শিল্প। ১৮৮৯-এ প্যারিসে আইফেল টাওয়ার নির্মাণের পর দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে। পিরামিডের দেহ এখন আর মসৃণ নয়। কতকটা কৃষ্ণবর্ণ। কাছে গেলে অমসৃণ চেহারাটা বেশি করে ফুটে ওঠে।

এই পিরামিডে ব্যবহৃত পাথরের চাঁইয়ের সংখ্যা তেইশ লক্ষ, প্রতিটির ওজন আড়াই থেকে পনেরো টন। ভিত বর্গক্ষেত্রাকার। পার্শ্বগুলির যোগফল সাতশো পঞ্চান্ন ফুট। তেরো একর জায়গায় এর অবস্থিতি। কৌণিক অবস্থান বাহান্ন ডিগ্রি। অতীতের উচ্চতা তেত্রিশ ফুট হ্রাস পেয়ে বর্তমানে চারশো পঞ্চান্ন ফুটে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ কারণ দর্শান, পঞ্চদশ শতকে অটোমেন তুর্করা কায়রোয় বাড়িঘর ও মসজিদ নির্মাণের জন্য পিরামিড থেকে চুনাপাথর চুরি করে নিয়ে যায়। নেবেই না বা কেন? এগুলি আসোয়ান থেকে সংগৃহীত উচ্চমানের চুনাপাথর। অত দূর থেকে কষ্ট করে সংগ্রহ করার বদলে পিরামিডের গা থেকে খসানো সহজতর বলেই ওদের মনে হয়।

খুফুর এই পিরামিডের প্রবেশপথ অন্যান্য পিরামিডের মতোই উত্তরদিকে। এখানে প্রবেশপথ দুটো। মূল পথ পিরামিড নির্মাণের প্রথম পর্যায়েই ভূস্তর থেকে পঞ্চান্ন ফুট ওপরে তৈরি করা হয়। অপরটি তৈরি হয় অনেক পরে নবম শতাব্দীতে। তৈরি হয় খলিফা এল মামুনের নির্দেশে। উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সাধু ছিল না। ভেতরের ধনরত্ন লুণ্ঠন করার জন্য তিনি দক্ষ পাথরের মিস্ত্রিদের নিয়োগ করেন। শ্রমসাধ্য কাজটি করে পঁচাত্তর মিটার সুড়ঙ্গ কেটে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা হয়। কাটা হয় যথেচ্ছভাবে, এবড়ো খেবড়ো। যে-কোনো উপায়ে অভ্যন্তরের রত্ন সংগ্রহই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য সেখানে পিরামিডের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়ার কোনো দায় তাদের ছিল না। এই সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তটি আদি এবং মূল সুড়ঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যে উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ নির্মাণ, তা সফল হয়নি। ভেতরের মূল্যবান সমস্ত জিনিস আগেই অপহৃত এবং লুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

এখন এই পিরামিডের ভেতরে ঢুকতে হলে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পথটিই ব্যবহার করা হয়। তবে যথেষ্ট কুঁজো হয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেটা কষ্টকর ব্যাপার। গবেষক ছাড়া অল্পসংখ্যকই সেই প্রয়াস করেন। মূল প্রবেশপথ থেকে লম্বা কিন্তু সংকীর্ণ করিডোর দিয়ে প্রায় তিনশো ত্রিশ ফুট নীচে নামলে মূল কক্ষে পৌঁছোনো যায়। স্থানটি ভূস্তর থেকে উনআশি ফুট নীচে অবস্থিত। মোটে আলো হাওয়া নেই। এই করিডোর থেকে ছেষট্টি ফুট এগোলে আরেকটা করিডোরে পৌঁছোনো যায়। তাতে পৌঁছোনো যায় পিরামিডের প্রাণকেন্দ্রে। সেখানে আছে আয়তক্ষেত্রাকার বিশাল একটি হল-লম্বায় একশো একষট্টি ফুট, উচ্চতায় উনপঞ্চাশ ফুট। আবার সুড়ঙ্গ পথে নীচে নামলে দ্বিতীয় যে কক্ষ মেলে, তা 'রাণীর কক্ষ' নামে পরিচিত হলেও কোনোভাবেই তা রানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সবচেয়ে বড়ো

গ্যালারিতে উঠলে শেষ প্রান্তে দেখা যায় তৃতীয় কক্ষটি। ওটাই খুফুর সমাধিস্থল। আয়তক্ষেত্রাকার। সমতল সিলিং। নটা গ্রানাইট পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি। প্রতিটির ওজন নাকি প্রায় পঞ্চাশ টন। সমাধিকক্ষের ওপর অবস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচটি কক্ষ। সমাধিকক্ষের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে দুটি সুড়ঙ্গ আছে যেগুলির প্রবেশপথ আয়তক্ষেত্রাকার।

খুফুর পিরামিড শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে রেখেছে। বহু ঝড় ঝঞ্ঝা এবং আঘাত আক্রমণেও তার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি। মিশরে আর কোনো প্রাচীন সৌধ না থাকলেও এই একটি মাত্র মহান শিল্প মিশরের মর্যাদা একইভাবে অটুট রাখতে সক্ষম হত।

ঐতিহাসিক মতে ২৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চতুর্থ রাজবংশের আমলে এটি নির্মিত। দশ থেকে কুড়ি বৎসর ধরে এই নির্মাণকাজ চলে। নানা মুনির নানা মত-গবেষকদের কেউ কেউ দশ বৎসর থেকে কুড়ি বৎসর সময়কালের হিসেব কষে পেয়েছেন। চতুষ্কোণ ভূমি এবং ক্রমোচ্চ গড়ানে ঢাল, সূক্ষ্ম অগ্র ও শীর্ষ বিশিষ্ট এই প্রাচীন মিশরীয় সমাধিমন্দির সম্পূর্ণ পাথরের তৈরি। সব পিরামিড তৈরি করা হয় নীলনদের পশ্চিমতীরে। ব্যাতিক্রম শুধু তৃতীয় রাজবংশের আমলে নির্মিত জাওয়েত-এল-আমওয়াত-এর ক্ষুদ্র পিরামিডটি। ওটি অবস্থিত পূর্বতীরে। প্রচলিত বিশ্বাস খুফুর প্রধান স্থপতি হেমোন-এর পরিকল্পনা করেন। কুড়ি বৎসর প্রতিদিন প্রায় আটশো টন করে পাথরের কাজ এখানে হয়। সম্পূর্ণ পিরামিডটার ওজন ঊনষাট লক্ষ টন। সম্ভবত এক লক্ষ দক্ষ শ্রমিক পালা করে এই নির্মাণকাজে নিযুক্ত ছিল। আড়াই হাজার বৎসর আগে বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখে যান, 'যখন রাম্পসিনিটোস রাজা, তখন শাসন ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খল, মিশরের উন্নতিও ঘটে যথেষ্ট। কিন্তু চিয়োপস্ যখন রাজা হন তখন প্রজাসাধারণের জীবনে সবরকম দুর্দশা নেমে আসে। তিনি সব মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেন।... সমস্ত মিশরবাসীকে তাঁর জন্য কাজ করার আদেশ দেন। নীলনদের আরবীয় পর্বতরাজির পাথরের খাদান থেকে পাথর আনার জন্য কিছু লোককে নিয়োগ করা হয়। আদেশ দেওয়া হয় অন্যদের সেই পাথর নদীপথে নৌকো করে নিয়ে আসতে হবে। আনতে হবে লিবিয়ান পর্বত নামে পরিচিত জায়গায়। একসঙ্গে শত সহস্র লোক কাজ করত। একটানা তিনমাস এই কাজ করতে হত। এইভাবে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে দশ বৎসর কেটে যায়। তৈরি হয় সেতু। যার ওপর দিয়ে পাথর টেনে আনতে হবে। মনে হয়, এই সেতু নির্মাণ পিরামিড নির্মাণের চেয়ে কম কষ্টসাধ্য ছিল না।... পাথর মসৃণ করে তার গায়ে চিত্র খোদাই করা হয়। এতে চলে যায় দশ বৎসর।' এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর প্রশ্ন, 'কোথায় থাকত মিশরের বিশাল পিরামিড যদি না থাকত দাস শ্রমিক?'

হেরোডোটাস সমসাময়িক জনশ্রুতি ও তথ্যর ভিত্তিতে চিয়োপস্ অর্থাৎ খুফুর সম্পর্কে আরও কঠিন অভিযোগ করেন। 'চিয়োপস্ এত বেশি বদমাশ ছিলেন যে আপন কন্যাকে গণিকালয়ে বসে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য করেন। তিনি পিতার আজ্ঞা অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করে